International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(1): 154-156
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 16-02-2026
Accepted: 25-02-2026
Publish : 26-02-2026

**Rupjit Bose**
Senior Research Fellow,
Department of Sahitya,
Central Sanskrit University,
New Delhi

**Correspondence:**
**Rupjit Bose**
Senior Research Fellow,
Department of Sahitya,
Central Sanskrit University,
New Delhi

# "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের আলোকে প্রেম, বিবাহ ও স্বীকৃতি: প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর আইনগত অবস্থানের বিশ্লেষণ

(Love, Marriage and Social Recognition in the Light of the Drama Abhijñānaśākuntalam: An Analysis of the Legal Status of Women in Ancient Indian Society)

**Rupjit Bose**

**DOI :** https://doi.org/10.5281/zenodo.19029048

## Abstract

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর আইনগত অবস্থান বিষয়ে বিতর্ক বিদ্যমান। যদিও প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র গুলিতে নারীর অধিকার ,স্ত্রীধন ,কর্তব্য-কর্ম বিষয়ে আলোচনা করা হলেও বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ছিল কষ্টসাধ্য কাজ। আমার এই গবেষণাপত্রে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের সাপেক্ষে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম, গন্ধর্ববিবাহ, সামাজিক স্বীকৃতি ও উত্তরাধিকারের আলোকে নারীর আইনগত সামাজিক অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। Feminist Legal Theory ও Socio-legal hermeneutics পদ্ধতির মাধ্যমে এই গবেষণা দেখায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান একেবারেই অবদমিত ছিল না; বরং সামাজিক স্বীকৃতি, মাতৃত্ববোধ ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করেই সে অবস্থান পরিবর্তনশীল ও প্রসঙ্গনির্ভর ছিল।

**Keywords:** প্রেম, বিবাহ, স্বীকৃতি, অধিকার

নারী ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ আজ ভারতবর্ষে বহু চর্চিত বিষয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তথা সাহিত্যে নারীদের অবস্থান, তাদের সামাজিক আইনগত অধিকার একটি অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত বিষয়। ভারতীয় সভ্যতার প্রারম্ভিক যুগ তথা বৈদিক যুগের নারীরা ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী। তাদের প্রজ্ঞা, স্বতন্ত্র চিন্তাধারা, জীবন দর্শন বিষয়ে তাদের বোধ প্রভৃতি সকল বিষয়ে তারা ছিলেন তৎকালীন সময় সাপেক্ষে বেশ এগিয়ে। যদিও ধর্মশাস্ত্রকাররা নারীর অধিকার নিয়ে কখনো সরব হয়েছেন, কখনো নীরব থেকেছেন। ধর্মশাস্ত্রকার মনু, যাজ্ঞবল্ক্য সমাজে নারীর অবস্থান, স্ত্রীধন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় সেই বিধান ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটক এই দ্বৈত বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নন্দনতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দলিল। আমরা অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে প্রেম ও প্রকৃতির মিলনের এক নান্দনিক চিত্র উপভোগ করি। কিন্তু এর পাশাপাশি তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের অধিকারের লড়াইয়ের বাস্তব চিত্রটিও দৃশ্যমান হয়। নাটকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম, গন্ধর্ব মতে বিবাহ, ভরা রাজসভায় দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান, যা শকুন্তলার বৈবাহিক স্বীকৃতিকে অস্বীকার করেছিল এবং তার মাতৃত্বকে কলুষিত করেছিল ও তাদের পুত্র ভরতের অস্তিত্বের বৈধতা প্রতিষ্ঠা- এটা কেবল রোমান্টিক আখ্যান হতে পারে না। এগুলো প্রাচীন ভারতীয় সমাজে একজন নারীর আইনগত পরিচয়, তার অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নকে জাগিয়ে তুলেছিল।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথম দর্শনই দুষ্যন্ত-শকুন্তলা পরস্পরের প্রতি প্রেমাকর্ষণ অনুভব করে। তাদের প্রেমের পরিণতিস্বরূপ রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করতে চাইলেও শকুন্তলা গুরুজনের অজ্ঞাতে তার প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া অন্যায় হচ্ছে ভেবে তাঁকে জানান যে মদনসন্তপ্তা হলেও নিজের উপর তার কোন প্রভুত্ব নেই। তখন রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিবাহে সম্মত করাতে গান্ধর্ব বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ এবং এই গান্ধর্বমতে বহু রাজর্ষিকন্যা বিবাহ করেছেন ও তাঁদের গুরুজনদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন- এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন। অবশেষে গান্ধর্ব মতে তাদের বিবাহ হয়। তবে রাজা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার এই বিবাহ কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধ। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে- "ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাহহসুরঃ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমো মতঃ॥" *[1] অর্থাৎ এখানে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী— ১. ব্রাহ্ম ২. দৈব ৩. আর্ষ ৪. প্রাজাপত্য ৫. গান্ধর্ব ৬. অসুর ৭. রাক্ষস ৮. পৈশাচ। এদের মধ্যে প্রথম চারটি শ্রেষ্ঠ, গান্ধর্ববিবাহ কামজাত হলেও স্বীকৃত। 'তুমি আমার পতি, 'তুমি আমার ভার্যা' - এই রকম পরস্পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে যে বিবাহ, তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ বলে। শাস্ত্রসম্মত হলেও এ বিবাহ "মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ" *[2] - এরকম কথা মনুসংহিতায় বলা হয়েছে। কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়রাই গান্ধর্ব বিবাহের অধিকারী। "গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্মো ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।"*[3]। পিতার সম্মতি ব্যতীত, যেখানে সামাজিক বিধি ও আচার সীমিত, তাদের প্রেমকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকেই এখানে মুখ্য প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রকার মনু এই গান্ধর্ব বিবাহকে স্বীকৃত দিলেও তা সামাজিকভাবে মর্যাদা প্রাপ্ত নয়। কারণ এ বিবাহে শাস্ত্র স্বীকৃতি থাকলেও সামাজিক মর্যাদা পাওয়া যায় না, যেহেতু তা সকলের অগোচরে সংঘটিত হয়। তাই শাস্ত্র ও সমাজের মধ্যে এই দ্বৈততা চিরকাল থেকেই যায়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্ব মতেই সম্পন্ন হয় এবং শকুন্তলার নিজে এ বিবাহের সম্মতি দেন, যা নারীর agency নির্দেশ করে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে পরে যখন শকুন্তলা তার সামাজিক স্বীকৃতি দাবি করে।

প্রকৃতপক্ষে শকুন্তলা ছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত সন্তান। কিন্তু জন্মাবধি সে পিতা-মাতা পরিত্যক্তা। পালিত হয়েছে কুলপতি মহর্ষি কর্ণ্বের স্নেহাশ্রয়ে মালিনী নদী তীরে তপোবনে। জন্মসূত্রে পেয়েছে অপরূপ রূপ-লাবণ্য। তপোনের বিশ্বস্ত হরিণীর মতো সে নাগরিক দুষ্যন্তের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ ঋষি অপ্সরা কন্যা হওয়া সত্বেও শকুন্তলা আশ্রমে পালিত হয়েছিলেন। আবার তিনি ছিলেন রাজা দুষ্যন্তের গন্ধর্ব পত্নী। ভবিষ্যতে সর্বদমন তথা ভরতের মাতা। এ হেন বিবিধ পরিচয়ের মধ্যে তার সামাজিক সংগ্রাম সুস্পষ্ট।

এত পরিচয়ের মাঝেও রাজা দুষ্যন্তের প্রত্যাখ্যান শকুন্তলার সামাজিক ও আইনগত সংকটের সৃষ্টি করে। যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাই সেখানে স্বামীর স্বীকৃতি ব্যতীত স্ত্রী ও সন্তানের মর্যাদা প্রাণবিদ্ধ হতো। কিন্তু শকুন্তলার ক্ষেত্রে দুর্বাসা কর্তৃক অভিশাপ জনিত বিস্মৃতির কারণে রাজা দুষ্যন্ত তাকে অস্বীকার করেন। তৎকালীন সমাজে নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নয়, পরিবারের সদস্যা হিসাবে গণ্য করা হতো। সেই সময় নারীর নিজস্ব পরিচয় সীমিত ছিল এবং তার মর্যাদা অনেকাংশে স্বামীর স্বীকৃতির উপর নির্ভর করতো।

যে দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকে গল্প এগিয়েছে তা হলো 'বিবাহ' ও 'স্বীকৃতি'। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন এবং অভিজ্ঞান স্বরূপ রাজার নামাঙ্কিত একটি আংটি উপহার দেন। কিন্তু ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের কারণে তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হন। পরে শাঙ্গরব ও শারদ্বত ও মাতা গৌতমীর সহিত রাজসভায় উপস্থিত হয়ে শকুন্তলা স্ত্রীর মর্যাদা ও বিবাহের স্বীকৃতি দাবি করলে রাজা তাকে প্রত্যাখ্যান করে, যা শকুন্তলার নারীত্বকে চূড়ান্ত অবমাননা করে। প্রকৃতপক্ষে দুর্বাসা শাপবশতঃই রাজার কোন কথাই স্মৃতিতে এল না। শকুন্তলা রাজাকে প্রমাণ স্বরূপ অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখাতে গিয়ে দেখলেন তা তার হাতে নেই। তপোনের গোপন প্রণয়ের সময়ের অনেক প্রমাণ দেখেও কোন ফল হয় না। বরং চারিত্রিক সততার প্রশ্নে তাকে অপমানিত হতে হয়। পরে ধীবর কর্তৃক প্রাপ্ত শকুন্তলার হারানো আংটির মাধ্যমে দুষ্যন্ত স্মৃতি ফিরে পান এবং শকুন্তলাকে স্বীকৃতি দেন। বিবাহের প্রমাণের অভাব, স্বামীর স্বীকৃতির উপর নির্ভরতা, সামাজিক অসম্মান- এই সকল ঘটনাই প্রাচীন সমাজে নারীর আইনগত দুর্বলতাকেই তুলে ধরে।

তবে এ কথাও ঠিক যে শকুন্তলা রাজসভায় নিজের অধিকার বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় যা প্রাচীন সমাজে নারীর সীমিত আইনি অধিকারকেও মর্যাদা দেয়।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মাতৃত্ব ছিল একজন নারীর অন্যতম প্রধান ভূমিকা। সন্তানকে কেন্দ্র করেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ব্যবধান দুরীভূত হয়। শকুন্তলার পুত্র ভরত পরবর্তীকালে রাজা হন। কিন্তু নাটকে কোথাও নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বা অধিকার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়নি। তৎকালীন সমাজে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উত্তরাধিকারীর জন্ম দেওয়া। এর থেকে অনুমান করা যায় সে যুগে নারীত্বের মর্যাদা মাতৃত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতো।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভীষণ শক্তিশালী ছিল। শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্ব উপদেশ দিয়ে বলেছেন- শ্বশুরকুলে সেবার কথা, বিনয়ের কথা, স্বামীর প্রতি ভক্তি এবং সকল অবস্থায় অনুগত থাকার কথা, সপত্নীর প্রতি সখী-ব্যবহারের কথা, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এমনকি দাসদাসীর প্রতিও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের কথা-

**শুশ্রুষস্ব গুরুন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে**
**ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।**
**ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষনুৎসেকিনী**
**যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়া বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥** *[4]

এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন সমাজে নারীর প্রধান দায়িত্ব ছিল স্বামীর প্রতি আনুগত্য রক্ষা করা, সংসারে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা ও সন্তানের জন্মদান করা। এ কারণে নারীর নিজস্ব সামাজিক পরিচয় খুব সীমিত ছিল এবং তার মর্যাদা পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে ধর্মশাস্ত্রেও স্ত্রীর মর্যাদা এবং গৃহস্থ জীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কথা বলা হয়েছে- "পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, পুত্র রক্ষতি বার্ধক্যে"। *[5]

শকুন্তলা চরিত্রটি প্রাচীন ভারতীয় নারীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। সে কোমল হৃদয়সম্পন্না, ধর্মনিষ্ঠ এবং আত্মসম্মা-নবোধসম্পন্না। দুষ্যন্তের প্রত্যাখ্যানের পরেও নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রেখেছেন। পরবর্তীতে তার সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অবশেষে নিজে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছে।

তবে আধুনিক সমাজে নারীর অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান নারীর স্বতন্ত্র মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে প্রণীত Hindu Marriage Act-1955 - এর মাধ্যমে হিন্দু বিবাহকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা, বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা, একাধিক বিবাহ (Polygamy) নিষিদ্ধ করা, নারীর আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে মহাকবি কালিদাস কেবল প্রেমের উপাখ্যানই রচনা করেননি, এটি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক দলিল। প্রেমের মাধ্যমে বিবাহ তৎকালীন সমাজে বৈধ ছিল। কিন্তু তার দ্বারা সামাজিক স্বীকৃতির কোন নিশ্চয়তা ছিল না। নারীর মর্যাদা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত হতো। এই নাটকের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম, গান্ধর্ববিবাহ, স্ত্রীর মর্যাদা, পুত্রের সামাজিক স্বীকৃতি সমাজের উপরে নির্ভরশীল ছিল। প্রমাণের অভাবে নারীর বক্তব্য ছিল ভীষণ দুর্বল। কোন আত্মপক্ষ সমর্থিত যুক্তিরই প্রাধান্যতা ছিল না। কিন্তু উপনিষদে বলে "সত্যমেব জয়তে"*[6], তাই প্রকৃত সত্যই জয়লাভ করল। সুতরাং বিজয়িনী শকুন্তলা কেবল একজন প্রেমিকা নয়, সে প্রাচীন সমাজে নারীর আইনের সংগ্রামের মূর্তমান প্রতীক।

**Endnotes**

1)মনুসংহিতা 3/21

2)মনুসংহিতা 3/32

3)মনুসংহিতা 3/26

4)অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ 4/18

5)মনুসংহিতা 9/3

6)মুণ্ডকোপনিষদ্ 3/1/6

**Bibliography**

কালিদাস। অভিজ্ঞান শকুন্তলম। অনুবাদ ও সম্পা. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি, 1854

কালিদাস। অভিজ্ঞান শকুন্তলা। অনুবাদ: গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস, 1895

কালিদাস। অভিজ্ঞানশকুন্তলম। সম্পা. ড. গঙ্গাসাগর রায়। বারাণসী: Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2009

কালিদাস। অভিজ্ঞানশকুন্তলম। সম্পা. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, 2005

কালিদাস। অভিজ্ঞান শকুন্তলা। অনুবাদ ও সম্পা. ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, 2010

মনু। মনুস্মৃতি। সম্পা. গঙ্গাসাগর রায়। বারাণসী: Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2006

মনু। মনুসংহিতা (বাংলা অনুবাদ ও টীকা সহ)। সম্পা. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, 1995

মনু। মনুসংহিতা। সম্পা. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, 2010